ডানা

নিউজলেটার : বিশেষ সংখ্যা

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

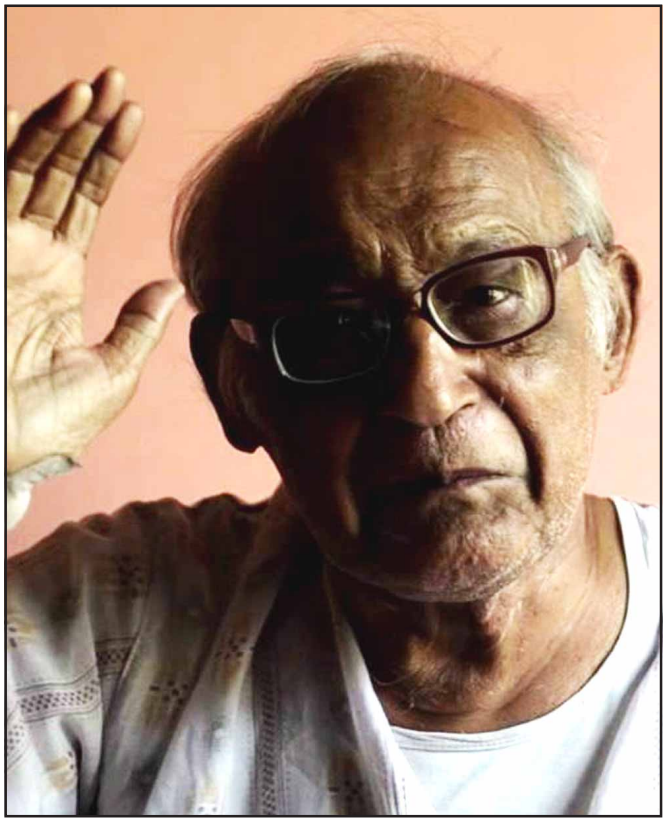

চণ্ডী লাহিড়ী

(১৯৩১ — ২০১৮)

অবিভক্ত বঙ্গের নবদ্বীপে ঊনিশশো একত্রিশের তেরোই মার্চ প্রবাদপ্রতিম কার্টুনিস্ট এবং সাংবাদিক চণ্ডী লাহিড়ীর জন্ম। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সে যুগের বিখ্যাত পত্রিকা 'লোকসেবক'-এ যুক্ত হয়ে পড়েন। সময়টা ১৯৫১ সাল। ছবি আঁকা আর জগতটা দেখার অন্যরকম চোখ ছিল তাঁর। রং, তুলি, পেনসিল আর পর্যবেক্ষণের মিশেল ক্রমেই তীক্ষ্ণতম 'কার্টুন' হয়ে নেমে আসে। ১৯৬১ সালে যুক্ত হন আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১৯৬২ সাল থেকে শুরু কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছোটবড় কার্টুনের। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। কেবলমাত্র সংবাদপত্র-ই নয়, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, পরবর্তীতে দূরদর্শনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর কাজের হাজারো আঁচড় থেকে গেছে। উদারহস্তে এঁকেছেন বহু স্বেচ্ছাসেবী এবং অনামা সংগঠনের জন্যও। ভাল কাজে চণ্ডী লাহিড়ীর তুলি আর কলম ছিল সবার আগে। ছবি আঁকার সাথে সাথেই ছিল অগাধ পাণ্ডিত্যের ঝরণাধারা। সেকালের গল্পে তাঁর ঝুলি ছিল ভরপুর। অন্যদিকে বিনা কাজে বসে থাকা তাঁর স্বভাব ছিল না, যখনই যতটা সময় পেয়েছেন, লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন অগাধ। যাদের মধ্যে 'গগণেন্দ্রনাথ : কার্টুন ও স্কেচ',

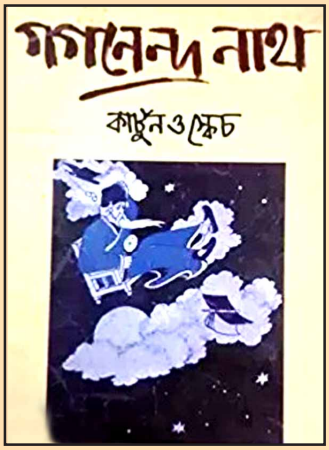

'বিদেশীদের চোখে বাংলা', History of Cartoons (1994), Visit India with Chandi (1973), Chandi Looks Around (1980), 'বসন্তক সমগ্র' বিখ্যাত। ছোটদের জন্য লিখেছেন, এঁকেছেন দেদার। তাঁর সৃষ্টি 'মিচকে' আর 'নেংটি' ছিল ছোটদের আনন্দের খোরাক।

তাঁর সপ্রাণ কথাবার্তা চারপাশের মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহের পরিমণ্ডল তৈরি করত। সারাজীবন ধরেই এই কাজটা তিনি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন।

গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮, দুপুর একটা পঞ্চাশ মিনিটে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন কিংবদন্তী চণ্ডী লাহিড়ী। 'ডানা'র প্রতিটি সদস্য আজ শোকস্তব্ধ। আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা রইল এই মহান হৃদয় শিল্পীর প্রতি।

মানুষের মনের বিচিত্র গতিবিধির কথা জানতেন

ড. অমিত চক্রবর্তী

আকাশবাণীতে কাজ করার সুবাদে যত জ্ঞানী-গুণী মানুষের কাছে আসার সুযোগ হয়েছে, শ্রী চণ্ডী লাহিড়ী তাঁদের অন্যতম। খবরের কাগজ আর ছোটদের পত্রিকায় কাফী খাঁ, শৈল চক্রবর্তী আর চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুন দেখতে দেখতে আমাদের বড় হওয়া। প্রথম আলাপেই চণ্ডীদা খুব কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন।

২০০০ সালে মন-মেরামতির জন্য 'ডানা' নামে প্রতিষ্ঠান তৈরির খবর পেয়েছিলেন তিনি। পরের বছর যখন 'বাতিক' নিয়ে বই প্রকাশের আয়োজন হলো — চণ্ডীদা জানিয়ে দিলেন, সেই বই-এর প্রচ্ছদ আঁকবেন তিনি। শুধু তাই নয়। ভবিষ্যতেও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার উদ্দেশে 'ডানা' থেকে যত বই প্রকাশিত হবে সব বই-এর প্রচ্ছদ এবং যাবতীয় ইলাসট্রেশন-এর দায়িত্ব যে তাঁরই—সেটাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন। ডানার সঙ্গে চণ্ডীদার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যাওয়া এভাবেই। ডানা'র কত যে অনুষ্ঠানে উনি অংশ নিয়েছেন তার হিসেব দেওয়া মুশকিল। মনের রোগে যারা ভোগে তাদের প্রতি অদ্ভুত এক সহানুভূতি ছিল ওঁর। মানুষের মনের বিচিত্র গতিবিধির কথা জানতেন তিনি। সূক্ষ্ম রসিকতাবোধের সঙ্গে সহমর্মিতার মেলবন্ধনেই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর অসাধারণ সব শিল্পকর্ম। চণ্ডীদার চলে যাওয়াটা 'ডানা'র সকলের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বাবা ছিল বন্ধু

তৃণা লাহিড়ী

বাবা ছিল বন্ধু। স্কুল ফাঁকি দিয়ে বার্গম্যান বা কুরোসাওয়ার সিনেমা দেখতে যাওয়া হোক বা এগজিবিশ্‌ন। প্রোপোরসান থেকে রঙের ব্যবহার, বাবার সাথে সব বিষয়ে গল্প ছিল আমার বেড়ে ওঠার রসদ। তা মুঘল স্থাপত্য হোক বা পাল যুগের হোক, বাউল নিয়ে বোঝানো হোক, সব কিছুতেই ছিলেন বাবা। একবার প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাইজি পার্বতী বড়ুয়াকে নিয়ে মেতে উঠলেন বাবা। বাবার এনিমেশনের এডিটর ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়ার ছেলে দেবকুমার বড়ুয়া। সেই আমার বাবার সাথে একা কোথাও যাওয়া। হাতিদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে জেনে ভয় পাওয়ার বদলে আরো উৎসাহিত করেছিল বাবা।

এম. ফিল করার সময় বাবা আমাকে দিল্লি থেকে হাইজাক করে নিয়ে গেলেন রাজস্থান। পুস্কর হ্রদে পৌঁছলাম লোকাল বাসে। সেখানে বাবার সাথে হ্রদে নেমে সাঁতার কাটা, রোজ স্কেচ করা। রাজস্থানের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কাজ ছিল এইগুলি। বেড়াতে যাওয়া, দূর্গম জায়গায় ট্রেকিং করা সবই করেছি বাবার সাথে।

স্কুল ফাঁকি করিয়ে সিনে সেন্ট্রাল বা ইউসিস এর আহ্বানে বার্গম্যান বা কুরোসাওয়া বা ভিভিয়ান লেকে দেখাটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। একবার ইউসিসে ছবি দেখতে গেছি। জায়গা ভর্তি দেখে গৌরকিশোর ঘোষ আমাকে একজন লম্বা মানুষের কোলে বসিয়ে দিলেন। তিনি দূরদর্শনে আমার চিচিংফাঁকের প্রেজেনটেশন দেখেছিলেন। ফিল্মে রোল দিতে চাইলেন, কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। লোকটি সত্যজিৎ রায়। গুপি-বাঘা ফিরে এলোর জন্যই রোল দিতে চেয়েছিলেন।

প্রথম চাকরিটা মাস্টার্স করতে গিয়ে লিনটাস্‌ এড এজেন্সিতে পেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা করতে দেয়নি। আসলে বাবা চাইত আমি ওঁনার মত গবেষণা করি। সব বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। ছোট-বড় সবার মাঝে সেটা বিলোতে তিনি তৈরি ছিলেন।

আমাদের ঝগড়ার একটাই বিষয় ছিল—কালো পেন। বাবা মাকে অভিযোগ করতেন আমি ওঁর পেন নিয়েছি, আর আমি বলতাম বাবা আমার পেন নিয়ে গেছে। এখন সেই ঝগড়া হবে না ভেবে অদ্ভুত লাগছে। ওঁনার মত স্ট্রাগল আমি করি তা তিনি চান নি বলেই আমার আর্টওয়ার্ক করা বা মাসকমিউনিকেশন পড়া নিয়ে আপত্তি করেছিলেন।

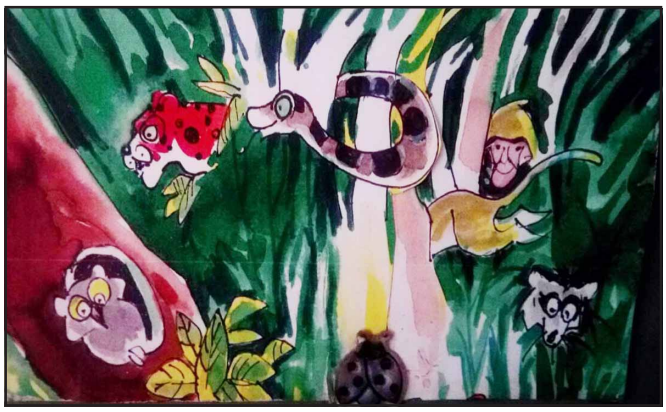

সব আত্মীয়দের সব অনুষ্ঠানে বাবা যেতেন, আত্মীয়দের মেহফিলের চোখের মণি ছিল বাবা। সব সময় আমাকে আত্মীয়দের চেনাতেন। আবার পাড়ার সবাইকে আত্মীয় করে নিতেও শিখিয়েছিলেন। পাড়ার দাদা-দিদিরা আজও তাই আমার পাশে। সৃজনশীল কেউ হলেই সে আত্মীয়। বাজার থেকে ব্যাঙ্ক, সব একাই সামলাতেন। রাতে আমি একটা বিদেশি ডার্কচকলেটের টুকরো বাবাকে দিতাম। সেটা খেতে খেতে বাবা নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে গল্প বলতেন। বই লেখা শেষ করলেই আমাকে পড়াতেন। গবেষণাধর্মী বই হলে আমি মতামত দিতাম।

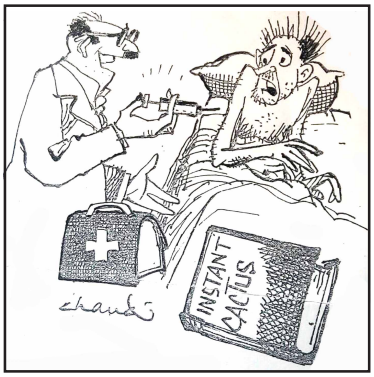

ভাল যেকোন কার্টুন আমি আর মা আগে দেখতাম। কোনও পরিবর্তনের সাজেশান দিলে সেটা নিতেন, তবে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হোত। অন্যের বইয়ের ইলাস্ট্রেশান অনায়াসে করতেন। ধন্যি মেয়ে বা হংসরাজের টাইটেল কার্ড বাবা এনিমেশান দিয়ে করেছিলেন। ছোট থেকে তাই বাড়িতে দেখেছি শম্ভু জেঠু, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় বা অজিতেশ-কেয়া জুটিকে।

সৃজনশীল মানুষ থেকে বাজারের সবজিবিক্রেতা বা পাড়ার যুবমস্তান ধরনের সব মানুষকেই ভালবাসতেন, আবার অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতেন। আমার মধ্যেও সেটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। রাস্তার কুকুরদের সাথেও মনের কথা শেয়ার করতেন।

মায়ের সাথেও সব কিছু শেয়ার করতেন। এই জুনেই ওদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর হোত। মার সাথে সকালে সময় কাটানোটা ছিল

চণ্ডীদার শেষ কাজ শিব্রামকে নিয়ে।

সুন্দর দাম্পত্যের প্রমাণ। মা-ও দারুন সামলাতে পারতেন বাবাকে। বয়সের ফারাক ছিল কে বলবে? বাবার উৎসাহে মায়ের বাটিক করা এবং আমার কাটি-সাঁটি....।

ক্রেতা সুরক্ষা বা পরিবেশ নিয়ে কেউ কোন কাজ নিয়ে এলে বাবা পারিশ্রমিক না নিয়েই কাজ করতে তৈরি থাকতেন। আমি ক্যানসার হওয়া অল্প বয়সি রোগীদের সুস্থ রাখতে কার্টুন চাই বললেই

রাত জেগে কার্টুন করতেন, সঙ্গে ছোট্ট গল্প। বলতেন বিপ্লবীদের বোমা ফেটে হাত চলে যাবার গল্প। ইতিহাস কংগ্রেস দেখার অভিজ্ঞতা বা গান্ধীজীকে সামনে দেখার অনুভূতির গল্পগুলো বাবা আমাকে শোনাতেন।

আমরা একা হয়ে গেলাম— মা আর আমি। বাবা কখনো টাকার চিন্তা করতেন না, তার নীতি ছিল প্লেন লিভিং হাই থিংকিং। সংসার কিভাবে চলবে তা ছিল মায়ের দায়িত্ব। কেউ ফুল দিলে বাবা অপছন্দ করতেন। গাছের যে প্রাণ আছে। তাই আমার বন্ধুরা আজকালকার নকল ফুল এনে দিত। সেগুলি পছন্দ করতেন। বাবার পছন্দ ছিল সুন্দর একটা সিঙ্গল বেড চাদর। ভালবাসতেন টালাপার্কের গাছের মধ্যে হাঁটতে। আর কাছের ছিল রাস্তার কুকুদের অনেকে, বইপড়ার নেশা আর প্রকৃতিকে ভালবাসার নেশা বাবা আমার আর মায়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন। ভাল থাকার রসদ। বাবা যেখানেই থাকো কার্টুন করা আর লেখা ছেড়ো না। একদিন সেগুলি দেখবো নিশ্চয়ই।

তুমি আমার মাঝে ছিলে, তুমি সবার মাঝে তোমার করা কাজের মধ্যে আছো, সেটাই আমাদের সাহস..... পাখি হয়ে উড়ছো, আমার পাশে, আমার কাছেই, জানিতো। তবে একটাই কষ্ট তোমার আরো কাজ বাকি, যা আমাদের শেষ করতে হবে। সাহস দিও।

তৃণা/তুলি আর তোমার গিমগুড়ি।

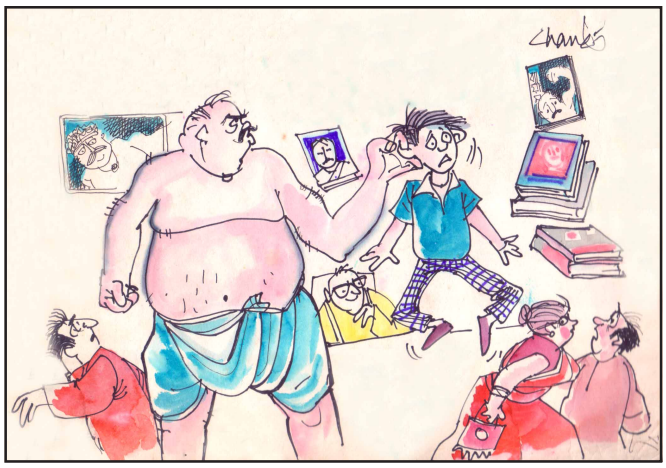

চলে গেলেন আমাদের আপনজন

রত্না মিত্র

১৯৮৫। সাংবাদিকতার কাজে যোগ দিয়েছি 'ইত্যাদি প্রকাশনী'তে। কয়েকদিনের মধ্যেই 'সুযোগের ফাঁস' শিরোনামে, আজকের শৈশব নিয়ে লেখা আমার একটি প্রচ্ছদ-নিবন্ধ প্রকাশিত হল 'সুকন্যা' পত্রিকায়। পরদিন আমাদের দপ্তরে চণ্ডীদা—'দ্যাখো, তোমার লেখা পড়ে এই ছবিগুলো আঁকা হয়ে গেল। ছাপার আগে পড়লে এতেই ইলাস্ট্রেশন হতে পারত।' বিস্ময়ে আনন্দে আমি হতবাক্! ভাবতে পারছি না আমার সামনে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী! এর পরের তিন বছরে আমাদের লেখা ছবির কত যে যুগলবন্দী! ততদিনে চণ্ডীদার কলমেরও ভক্ত হয়ে পড়েছি।

'ইত্যাদি প্রকাশনী' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরের কয়েকটা বছরে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা যোগাযোগ পুনর্জীবন পেল 'ডানা' আর 'ইচ্ছে'-র সুবাদে। কত অভিব্যক্তিতেই যে পেলাম তাঁকে! চণ্ডীদা মানেই সহজ আনন্দের চিরচঞ্চল এক তরুণ প্রাণ। তির্যক ছবি, শানিত লেখনীর আড়ালে কী ক'রে যে ধারণ করলেন এমন অনাবিল প্রাণময় ব্যক্তিত্ব! বয়স আর প্রতিকূলতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিভাবে হৈ হৈ ক'রে বাঁচতে হয়, তার দৃষ্টান্ত রেখে চলে গেলেন আমাদের আপনজন, আমাদের চণ্ডীদা।

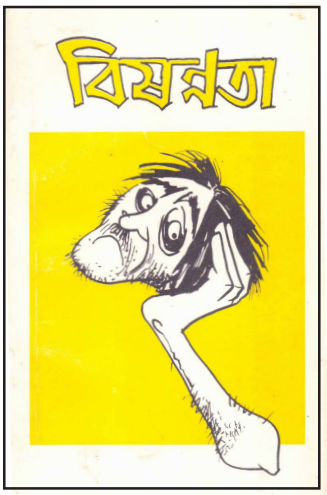

ডানা প্রকাশিত বইয়ে প্রচ্ছদ চণ্ডী লাহিড়ীর কলমের টানে উজ্জ্বল।

চণ্ডীদাকে যেমন দেখেছি

ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডী লাহিড়ীর মুখোমুখি হওয়ার ঢের আগে থেকেই 'তির্যক'-এর চক্করে পড়েছিলাম। মানুষ চণ্ডীদার সাথে আলাপ নয়ের দশকের শেষ দিকটায়, তখন 'ডানা' তৈরি হচ্ছে। সংসারে এমন মানুষ থাকেন যাঁদের অন্যকে কাছে টেনে নিয়ে আপন করতে দু'মিনিটও লাগে না, চণ্ডীদা ছিলেন সেই গোত্রের মানুষ। কাজে কাজেই ছবি আঁকা আর দেখার মধ্যে ব্যাপারটা থেমে রইল না, তার স্থান নিল চণ্ডীদার পাইকপাড়ার এম.আই.জি কোয়ার্টার্স-এর বসতকুঠি। আমার হাসপাতাল তখন পাইকপাড়ার পাশেই, অতএব যাতায়াতের কোনও কার্পন্য ছিল না। মাঝে মধ্যে চণ্ডীদাও চলে আসতেন হাসপাতালে, আমার বন্ধু-বান্ধবরাও সেই সব আড্ডায় জড়িয়ে পড়তেন। 'ডানা'র শুরু থেকেই ফি বছর বেরোনো বইয়ের প্রচ্ছদে চণ্ডীদার সাক্ষর থাকবেই থাকবে। বইমেলায় 'ডানা'র বই বিক্রির একটা প্রধান রহস্যই ছিল চণ্ডীদার আঁকা প্রচ্ছদ।

ঘরে রয়ে গিয়েছে সাদা-কালোর রহস্য আর এলোমেলো আঁকিবুকি ভরা অজস্র পাতা।

২০০৯-এর শুরুতে ছোটদের পত্রিকা 'ইচ্ছে' শুরু করলাম সবাই মিলে। ভরসা সেই চণ্ডীদাই। নামাঙ্কণ থেকে প্রচ্ছদ সবই তেনার। নতুন নতুন আইডিয়া দিতেন, সাথে ছবিও। পত্রিকার শুরুর দিনটি থেকে তাঁর সপ্রাণ উপস্থিতি ছিল আমাদের ভরসাস্থল। ধমক ধামকও কম খেতাম না। একেবারে আদর্শ অভিভাবক যাঁকে বলে। অন্যদিকে আবার, 'ছুটলে কথা থামায় কে?' কী-ই তার বিস্তার! পুরোনো কলকাতা, জনপদ, সংস্কৃতি, ইতিহাস সবকিছুতে চণ্ডীদার অগাধ পাণ্ডিত্যের আস্বাদন হত তাঁর কাছে দু'দণ্ড বসতে পেলে। কথা বলতে বলতে কখনও সখনও কোথায় যেন হারিয়ে যেতেন, বুঝতাম মনের মাঝে ডুব দিয়ে খুঁজেই চলেছেন

কিছু একটা, কাছে থেকেও তখন আমরা নিতান্তই দুরের মানুষ। সেই সময়গুলোতেই আসল শিল্পী আর সাধক মানুষটাকেই যেন দেখতাম। সারাজীবন ধরে সকলের জন্য করেছেন, কিন্তু মুখ ফুটে কখনও নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে পারেননি কাউকে। আত্মবিস্মৃত সমাজও তাঁকে কখনও কিছু ফিরিয়ে দেবার কথাও ভাবেনি।

কয়েকদিন আগে চলে গেলেন চণ্ডীদা। শুনেছি হাসপাতালে ভর্তি হয়েও কাগজ-কলম চেয়েছিলেন ছবি আঁকবেন বলে। কয়েকঘন্টা আগেও বোঝা যায়নি এতটা দুরের পথে হেঁটে যাবেন আজকেই। বৌদি রইলেন, তুলি রইল। পড়ে রইল রাজ্যের সাদা-কালোর রহস্য আর এলোমেলো আঁকিবুকি ভরা অজস্র পাতা। যাদের বুকে ধরা রইল একজন আনন্দময় মানুষের ছিয়াশি বছরের আলো!

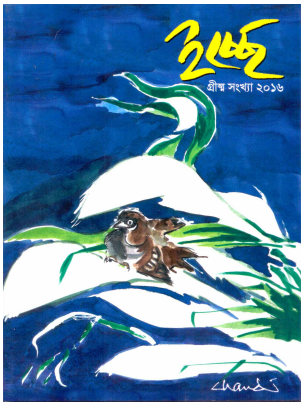

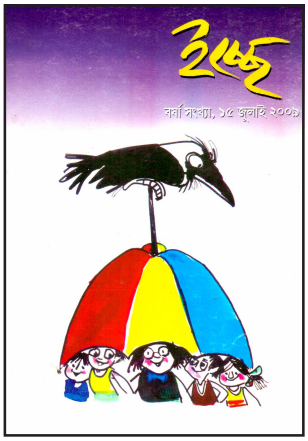

চণ্ডীদার আঁকা 'ইচ্ছে' পত্রিকার প্রচ্ছদ।

ডানা-র পক্ষে ডা. সায়নদীপ ঘোষ কর্তৃক ১৫/৪, রহিম ওস্তাগর রোড, যোধপুর পার্ক, কোলকাতা-৭০০০৪৫ থেকে প্রকাশিত ও এনট্রাস্ট পাবলিসিটি, ৪৫/১/১ বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৩ থেকে মুদ্রিত।